থ্রি লা র উ প ন্যা স

আসমান জমিনের উপাখ্যান

আরিফ খন্দকার

মনন প্রকাশ

ভূ মি কা

আসমান জমিনের উপাখ্যান একটি গভীর মানবিক থ্রিলার, যেখানে জীবনের নির্মম বাস্তবতা, সামাজিক বৈষম্য, এবং ক্ষমতার দাপট একসঙ্গে মিলে একটি অসাধারণ গল্প তৈরি করেছে। এই উপন্যাসে আসমান এবং জমিনের প্রতীকী ব্যবহার মানুষের শ্রেণি বৈষম্য, ক্ষমতা ও নির্ধারণের গল্প বলে। এখানে আসমান সেই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা সমাজের নিয়মকানুন তৈরি করে এবং নিজের স্বার্থে তা ভাঙে। অন্যদিকে জমিন সেই সাধারণ মানুষের প্রতীক, যারা প্রতিনিয়ত অন্যায়ের শিকার হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করার শক্তি পায় না।

এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রানু, আনিস, এবং তাদের সন্তানরা–একটি সংগ্রামী পরিবার, যাদের জীবন সমাজের ক্ষমতাশালীদের খেলা এবং ক্ষমতার লড়াইয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। আনিসের ছোট্ট একটি দোকান তার পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় ছিল, কিন্তু সেটিও ধ্বংস হয়ে যায়। আর্থিক অনটন আর বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মধ্যে ঘটে যায় এক ভয়াবহ ঘটনা–তাদের ছোট মেয়েটিকে ফেলে দেওয়া হয়, এবং সেখান থেকে গল্প মোড় নেয় এক ভয়ংকর থ্রিলারের দিকে।

এই গল্পে উঠে এসেছে মানবিকতার সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক, আবার নৈতিকতার পতনের অন্ধকার দিকও। বাহার ও সীমার সম্পর্ক, রানুর সঙ্গে শওকত, চন্দন, এবং রবিনের টানাপোড়েন–সব মিলিয়ে এটি একটি রহস্যময় জালের মতো, যা প্রতিটি চরিত্রকে ভিন্নভাবে জড়িয়ে ফেলে।

'আসমান জমিনের উপাখ্যান' শুধুমাত্র একটি পরিবারের সংগ্রাম নয়। এটি আমাদের সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা অন্যায়, বৈষম্য, এবং ক্ষমতার অমানবিক ব্যবহারের গল্প। এখানে প্রতিটি মুহূর্তে লুকিয়ে আছে অপ্রত্যাশিত মোড়, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, এবং রহস্য।

গল্পটি শুরু হয় একটি সাধারণ ঘটনায়, কিন্তু ধীরে ধীরে তা পরিণত হয় একটি জটিল এবং শ্বাসরুদ্ধকর থ্রিলারে। এই উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রের একটি নিজস্ব গল্প আছে, এবং তারা প্রত্যেকে সমাজের এক অন্ধকার দিকের প্রতিনিধিত্ব করে। রানুর ভালোবাসা, আনিসের লড়াই, বাহারের আত্মত্যাগ–সবকিছু মিলিয়ে এই গল্প এক অর্থবহ এবং হৃদয়স্পর্শী যাত্রার দিক নির্দেশ করে।

আসমান জমিনের উপাখ্যান সেই গল্প, যা কেবল পাঠকদের কল্পনাকে প্রভাবিত করবে না, বরং তাদের হৃদয়ে একটি অমলিন দাগ কাটবে। এটি কেবল একটি উপন্যাস নয়, এটি আমাদের সমাজের বাস্তবতার একটি প্রতিফলন। এই থ্রিলারের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি পৃষ্ঠা আপনাকে ধরে রাখবে, আপনাকে ভাবাবে, এবং আপনাকে একটি চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাবে।

আরিফ খন্দকার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা

আনিস তখন অফিস থেকে ফিরেছে। ক্লান্ত শরীরটাকে সোফায় এলিয়ে দিয়ে একটুখানি আরাম খোঁজার চেষ্টা করছে। বাইরের ম্লান আলো ঘরের ভেতর ঢুকে একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতার আবহ তৈরি করেছে। রানু রান্নাঘরে কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু মুখে অস্বস্তির ছাপ স্পষ্ট। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে আসা হালকা বাতাসেও তার অস্থিরতা কমছে না। আনিস এক কাপ চা চেয়ে রানুকে ডাকতে যাবেই, এমন সময় রানুর গলা শোনা গেল, ‘শুনছো? মেয়ে তিনটা দিন দিন যেন বশ মানতে চায় না।’

আনিস একটু বিরক্ত হয়েই রানুর দিকে তাকাল। ‘কী হলো আবার? সারাদিন ধরে অফিসে অতটুকু চাপ সামলিয়ে বাড়ি ফিরেছি, এখন এসব শুনতে চাই না,’ বলে আনিস মাথা পেছনের দিকে হেলিয়ে দিল।

রানু কপালে ভাঁজ ফেলে এগিয়ে এলো। ‘তোমাকে তো কথাগুলো শোনাতেই হবে। ইরা সারাক্ষণ ফোনে পড়ে থাকে, কার সঙ্গে এত কথা বলে জানি না। নীরা নিজের বই নিয়ে এমন মগ্ন থাকে যে বাড়িতে কে কী করছে, সেটাই খেয়াল থাকে না। আর সারা... সে তো পুরো বাড়ি মাথায় তুলে রাখে।’

আনিস ঠান্ডা স্বরে বলল, ‘তুমি একটু ওদের ছেড়ে দাও, রানু। মেয়েরা বড় হচ্ছে, তাদেরও তো একটু স্বাধীনতা লাগবে।’

স্বাধীনতা!" রানু যেন বিস্ফোরিত হলো। ‘তুমি বোঝো না, বেশি স্বাধীনতা দিলে সব হাতের বাইরে চলে যাবে। ইরা এখন যা করছে, সেটা কি স্বাধীনতা? সারাদিন কার সঙ্গে কথা বলে, সেটাও খোঁজ নাও না তুমি।’

আনিস আর কথা বাড়াল না। সে জানে, রানুর কথা কখনো শেষ হবে না। ইরার প্রসঙ্গ আনলে রানুর রাগ দ্বিগুণ হয়। মেয়ে তিনটার বয়স অনুযায়ী প্রত্যেকেরই আলাদা অভ্যাস, কিন্তু রানুর চোখে সবকিছুই সমস্যা।

ইরা তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে। তার হাসির শব্দ নিচতলা পর্যন্ত শোনা যায়। রানু রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, ‘ইরা! এত জোরে কথা বলছো কেন? বাড়ির মানুষগুলো কানের পর্দা বিকল হয়ে গেছে নাকি?’

ইরা ঘাড় বাঁকিয়ে রানুর দিকে একবার তাকাল। তারপর কোনো উত্তর না দিয়েই ফোনে কথা চালিয়ে যেতে লাগল। আনিস এ দৃশ্য দেখে মুচকি হাসল। সে জানে, ইরা ইচ্ছে করেই রানুর কথায় সাড়া দেয় না।

ড্রয়িংরুমে বসে নীরা তখন একগুচ্ছ বই সামনে খুলে বসে। মেয়েটার পড়ার প্রতি গভীর মনোযোগ দেখে আনিসের ভালোই লাগে। নীরার জন্য তার আলাদা একটা গর্ব আছে। মেয়ে পড়াশোনায় এত মনোযোগী যে রানুর কোনো অভিযোগ নীরাকে নিয়ে খুব একটা জোরালো হয় না। রানু মাঝে মাঝে বলে, ‘নীরা যদি আরেকটু হাসিখুশি হতো, তা হলে ভালো লাগত।’ কিন্তু নীরার মুখে এক ধরনের স্থায়ী গাম্ভীর্য। বইয়ের ভেতর ডুবে থাকা তার একমাত্র আনন্দ।

সারা তখন উঠানে ছোট্ট একটা ফুটবল নিয়ে খেলা করছিল। তার ছোট ছোট চিৎকার, লাফালাফি, আর হঠাৎ হঠাৎ পড়ে গিয়ে কাঁদা– এগুলো নিয়েই বাড়ির ছোট সদস্যটির দিন কাটে। সারা যেন রানুর সব অস্থিরতাকে আরো জটিল করে তোলে। রানু প্রায়ই বলে, ‘এই মেয়েটা যদি একটু শান্ত হতো, তা হলে আমার জীবন অনেক সহজ হতো।’

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। আনিস দরজা খুলতেই দেখা গেল রফিক। আনিসের পুরোনো বন্ধু। গায়ে ফর্মাল শার্ট, চোখে ক্লান্তি। ‘কী রে, অনেকদিন পর এলে?’ আনিস একটু অবাক হয়েই বলল।

রফিক একটা ম্লান হাসি দিয়ে ভেতরে ঢুকল। ‘হ্যাঁ রে, ব্যস্ততায় সময়ই পাই না। ভাবলাম আজ একবার দেখা করে যাই।’

রানু রফিককে দেখে ভেতর থেকে এসে বলল, 'আসুন, বসুন। চা দিচ্ছি।' রফিক রানুর দিকে একবার তাকিয়ে নম্র গলায় বলল, 'আপনার বাড়ি এখনো আগের মতোই প্রাণবন্ত। মেয়েগুলোর কথা অনেক শুনেছি, আজ দেখা হলো।'

রফিকের কথা শুনে আনিস একটু হেসে বলল, 'ওরা এখনো ছোট। দিন দিন তাদের সামলানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছিস।'

রফিক আনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জীবনটা তো এমনই। আমরা যখন বড় হচ্ছিলাম, তখনও আমাদের মা-বাবা এভাবেই ভাবত। সময় বদলে গেছে, কিন্তু মা-বাবার চিন্তা একই রয়ে গেছে।'

আনিসের মুখে একটু চিন্তার ছাপ পড়ল। রানু রান্নাঘর থেকে চায়ের কাপ নিয়ে আসার আগেই রফিক বলল, 'কী রে, ইরা কোথায়? ওর তো অনেক গল্প শুনেছি।'

আনিস হেসে ইরার দিকে ইশারা করে বলল, 'বারান্দায়। ফোনে ব্যস্ত। আজকাল আমাদের দিকেও তাকায় না।'

রানু তখন চায়ের কাপগুলো টেবিলে রেখে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। রফিকের সঙ্গে আনিসের কথোপকথন শুনে তার মনে হচ্ছিল, এই জীবনের সমস্যা যেন কখনো শেষ হবে না। মেয়েদের বেড়ে ওঠার গল্প আর আনিসের নির্বিকার মনোভাব, সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত টানাপোড়েন চলছে।

রানু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দেখো, একদিন ওরা বড় হবে। তখন আমাদের কথাগুলো হয়তো মনে পড়বে। কিন্তু তখন আমরা আর পাশে থাকব না। এই সময়গুলোই ওদের শেখানোর।'

রফিক আনিসের দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর স্বরে বলল, 'রানুর কথা ফেলিস না। মেয়েগুলোর এখনো সময় আছে। ওদের বোঝানোর চেষ্টা কর।'

আনিস চুপ করে থাকল। রানুর অস্থিরতা আর রফিকের পরামর্শ, সবকিছু যেন তার ক্লান্ত মনকে আরও ভারী করে তুলছে। ঘরের ভেতর এক ধরনের অস্থির নীরবতা নেমে এলো।

আনিস সকাল থেকেই অস্বস্তি বোধ করছিল। অফিসে ঢোকার পথে তার মনে হচ্ছিল, আজ কোনো অঘটন ঘটতে পারে। কয়েকদিন ধরে অফিসের পরিবেশও অদ্ভুতভাবে ভারী হয়ে উঠেছে। তার টেবিলের ওপর পড়ে থাকা লাল ফাইলটা যেন কোনো দুঃসংবাদের বার্তা বহন করছিল। গত সপ্তাহে তার বস, শওকত সাহেব, সেই ফাইলটা হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই প্রজেক্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, আনিস। গন্ডগোল হলে কিন্তু বড় সমস্যায় পড়ব আমরা।'

আজ সকাল থেকেই আনিসের মাথায় ফাইলটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। এদিকে ঘরে থেকেও শান্তি ছিল না। রানুর সঙ্গে ইরাকে নিয়ে একটু তর্ক হয়েছে। এসব অশান্তি আর অফিসের দায়-দায়িত্ব মিলে তার চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে আছে।

অফিসে ঢুকেই আনিস নিজের ডেস্কে বসল। ঠিক তখনই সামি, তার সহকর্মী এবং কাছের বন্ধু, টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। সামির মুখে চিন্তার ছাপ। 'তুমি কেমন আছো?' সামি জিজ্ঞেস করল।

আনিস হালকা হাসি দিয়ে বলল, 'ভালো নেই রে। মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তার ঝড় বইছে।'

'কেন? আবার কী হলো?' সামি চেয়ারে বসল।

আনিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফাইলটা সামির দিকে ইশারা করে বলল, 'এই প্রজেক্টটা নিয়ে বড় ধরনের গন্ডগোল হয়েছে। আমি গত কয়েকদিন ধরে ফাইল ঘাঁটছি, কিন্তু সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না।'

সামি কপাল কুঁচকে বলল, 'কী ধরনের গন্ডগোল?'

'হিসাব-নিকাশে বড় ভুল ধরা পড়েছে,' আনিস বলল। 'এটা ইচ্ছাকৃত কি না, সেটা নিশ্চিত হতে পারছি না। তবে যদি বিষয়টা প্রকাশ্যে আসে, আমাদের কোম্পানির সুনাম ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।'

সামি একটু ভেবে বলল, 'তাহলে বসের সঙ্গে কথা বলিস না কেন?'

'আমি চেষ্টা করেছি,' আনিস বলল। 'কিন্তু উনি আমার কথা শুনতে চাইলেন না। উপরন্তু মনে হচ্ছে, এই দোষটা আমার ওপর চাপানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।'

সামি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'তুমি তো নির্দোষ। তোমার ভয়ের কিছু নেই।'

আনিসের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। 'নির্দোষ হওয়াটা এখানে কোনো কাজে আসবে না, সামি। দোষ চাপানোটা এখানে খুব সহজ কাজ। ফাইলের দায়িত্বে আমার নাম আছে। যদি এই ঝামেলার দায় নিতে হয়, প্রথম আঙুলটা আমার দিকেই উঠবে।'

সামি কিছু বলার আগেই ইন্টারকম বেজে উঠল। আনিস ফোনটা ধরতেই শওকত সাহেবের গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'আমার কেবিনে আসুন, আনিস।'

ফোন রেখে আনিস সামির দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুরু হয়ে গেল।'

সামি একটু চিন্তিত গলায় বলল, 'যা, দেখে আস কী চায়। আর দুশ্চিন্তা করিস না।'

কেবিনে ঢুকে আনিস শওকত সাহেবকে সিগারেট জ্বালাতে দেখে থমকে দাঁড়াল। শওকত সাহেব ইঙ্গিত করলেন বসার জন্য। আনিস চুপচাপ চেয়ারে বসল।

'প্রজেক্ট নিয়ে কাজ কতদূর?' শওকত সাহেব সরাসরি প্রশ্ন করলেন।

'স্যার, আমি ফাইলটা ঘাঁটছি। কিন্তু সমস্যাগুলো খুব জটিল।' আনিস গলায় আত্মবিশ্বাস ধরে রাখার চেষ্টা করল।

শওকত সাহেব সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'তুমি জানো, এই প্রজেক্টটা আমাদের কোম্পানির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। কিন্তু সমস্যা হলো, হিসাব-নিকাশের ভুল যদি ঠিক না হয়, তাহলে তদন্ত হবে। এবং জানোই তো, দোষটা কার ওপর চাপানো হবে।'

আনিসের শরীর শিউরে উঠল। 'স্যার, আমি তো কোনো ভুল করিনি।'

শওকত সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমি জানি, আনিস। কিন্তু এই ধরণের পরিস্থিতিতে নির্দোষ বা দোষী ব্যাপারটা মুখ্য নয়। মুখ্য হলো, কোনো একজনকে বলি দিতে হবে। আর তুমিই প্রজেক্টের ইনচার্জ।'

আনিস কিছু বলার সাহস পেল না। তার হাত-পা কাঁপতে লাগল। মাথার মধ্যে একটাই চিন্তা ঘুরছিল–সে কীভাবে এই দায় এড়াবে?

কেবিন থেকে বের হয়ে আনিস নিজের ডেস্কে এসে বসে পড়ল। সামি তৎক্ষণাৎ তার কাছে এসে বলল, 'কী হলো? কী বলল?'

আনিস নিস্তেজ গলায় বলল, 'বলল, দোষ চাপানোর জন্য কাউকে লাগবে। আর সেটা সম্ভবত আমিই।'

সামি অবাক হয়ে বলল, 'তুই কী বললি?'

'আমি কিছু বলিনি,' আনিস মাথা নিচু করে বলল। 'বলেই বা কী লাভ? আমি জানি, পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, আমাকেই বলি দেওয়া হবে।'

সামি একটু চুপ থেকে বলল, 'দেখ, সত্যটা সামনে আসবে। তুই যদি নির্দোষ থাকিস, কেউ তোকে কিছু করতে পারবে না।'

কিন্তু আনিস জানত, অফিসের রাজনীতিতে সত্যের কোনো মূল্য নেই। দোষ চাপানোটা সবচেয়ে সহজ উপায়। বাড়ি থেকে অফিস পর্যন্ত অশান্তি, মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা, আর এখন চাকরি হারানোর ভয়–সব মিলিয়ে আনিসের মাথার ভেতর যেন এক বিশাল ঝড় বইছিল। সে বসে রইল, কিন্তু তার মনে হলো, পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার কোনো পথ নেই।

প্রতিদিনের মতো আজও আনিস অফিসে পৌঁছেই টেবিলে রাখা ফাইলগুলোতে চোখ বুলাচ্ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে তার কাজের চাপ এতটাই বেড়েছে যে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তার মাথা কখনো শান্ত থাকার সুযোগ পায় না। অফিসের এক কোণে বসে, ফাইলের পাতা উল্টাতে উল্টাতে সে ভাবছিল, কেন তার উপর এত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

শওকত সাহেব, অফিসের বস, গত এক মাস ধরে আনিসকে নানাভাবে প্রজেক্টের কাজ নিয়ে চাপে রেখেছেন। 'এই প্রজেক্ট সফল না হলে কোম্পানির ভবিষ্যৎ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে'–এই কথাটা শওকত সাহেব প্রতিদিনই বলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আনিস জানত, সমস্যার আসল জায়গাটা প্রজেক্টের জটিলতায় নয়, বরং এর পেছনে লুকিয়ে থাকা কিছু নোংরা ষড়যন্ত্রে।

তার সহকর্মী সামি, যাকে এতদিন বিশ্বস্ত মনে করেছিল, ইদানীং তার আচরণে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে। সামি প্রায়শই শওকত সাহেবের কেবিনে ঢুকছে, সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটাচ্ছে। কিছুদিন আগে আনিস শুনেছিল, প্রজেক্টের বাজেটের একটা অংশ অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই নিয়ে সরাসরি কিছু বলা হয়নি, তবে ঘুরে ফিরে ইঙ্গিতগুলো সব আনিসের দিকে আসতে শুরু করেছে।

আজ সকালে অফিসে ঢোকার পর আনিস দেখল, তার ডেস্কের উপর একটা নোট রাখা আছে। তাতে লেখা: 'প্রজেক্টের

আর্থিক গরমিল নিয়ে বসের সাথে কথা বলো।' আনিস জানত, এই নোটের অর্থ কী। সে শওকত সাহেবের কেবিনে ঢোকার প্রস্তুতি নিতে নিতে নিজেকে মানসিকভাবে শক্ত করার চেষ্টা করছিল।

শওকত সাহেব তখন তার চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিলেন। আনিস ভেতরে ঢুকতেই তিনি তাকে ইঙ্গিত করলেন বসার জন্য। 'আনিস,' তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি জানো, প্রজেক্ট নিয়ে আমি কতটা চিন্তিত। কিন্তু এভাবে ভুল চলতে থাকলে আমাদের সবাইকেই বড় সমস্যায় পড়তে হবে।'

'স্যার, আমি কাজ করছি। কিন্তু সমস্যাটা কোথায় সেটা বুঝতে পারছি না,' আনিস শান্ত গলায় উত্তর দিল।

শওকত সাহেব কপাল কুঁচকে বললেন, 'সমস্যাটা বাজেট নিয়ে। দশ লক্ষ টাকার হিসাব ঠিকঠাক মিলছে না। এবং এটা দেখা যাচ্ছে, তোমার তত্ত্বাবধানে থাকা খাতগুলোতেই এই গরমিল।'

এই কথায় আনিসের মুখ শুকিয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'স্যার, আমি গরমিলের জন্য দায়ী নই। আমি হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছি। কোথাও কোনো ইচ্ছাকৃত ভুল করিনি।'

শওকত সাহেব হাত তুলে বললেন, 'আমি জানি, তুমি বলবে তুমি কিছু জানো না। কিন্তু এটা তদন্তের বিষয়। কোম্পানি যদি তদন্ত করে এবং দোষ তোমার ওপর পড়ে, তাহলে আমি কিছু করতে পারব না।'

আনিস হতবাক হয়ে বসে রইল। সে বুঝতে পারছিল, এই পুরো বিষয়টায় তাকে বলি বানানোর চেষ্টা চলছে। সামি, যে এতদিন তার পাশে ছিল, হয়তো এই ষড়যন্ত্রের পেছনে রয়েছে।

কিছুদিন ধরে সামি শওকত সাহেবের সঙ্গে অস্বাভাবিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আনিস জানে, প্রজেক্টের বাজেট ব্যবস্থাপনায় সামি অনেক কাজ করেছে, কিন্তু সবকিছুর দায় তার ওপর চাপানোর প্রস্তুতি চলছে।

ঠিক তখনই শওকত সাহেব বললেন, 'আর একটা বিষয় আছে, আনিস। বাজেটের এই গরমিলের কারণে তোমার এই মাসের বেতন আমরা সাময়িকভাবে স্থগিত করেছি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটা কেটে নেওয়া হবে।'

এই কথায় আনিস যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। 'স্যার, এটা অন্যায়। আমার কাজের জন্য আমি সবসময় সতর্ক থেকেছি। বেতন কেটে নেওয়ার কোনো যুক্তি আমি দেখি না।'

শওকত সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেখো, আনিস। আমি তোমার পাশে আছি। কিন্তু কোম্পানির নীতিমালা এড়ানো যায় না। তদন্ত শেষ হলে তোমার বেতন পুনরায় দেওয়া হবে।'